মানবতার সোনার থালা ও র‍্যাব

জয়নাল আবেদীন

হেঁটে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেয়ে যে গাড়ীতে যাওয়া আরামদায়ক তার জন্য ব্যাখ্যা বা উপদেশের দরকার হয় না। তবে গাড়ী চালিয়ে অফিসে যাতায়াতের চেয়ে যে ট্রেনে যাওয়া সুখপ্রদ বা অনেক বেশী কাঙ্খিত হতে পারে এর জন্য মনে হয় কিছুটা ভূমিকা বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। *অফিস আওয়ারে* সিডনীর মতো শহরগুলোতে গাড়ি চালিয়ে অফিসে যাতায়াত যে কি যন্ত্রনার, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। গন্তব্যটা যদি মূল শহর বা শহরের খুব কাছাকাছি হয়, তাহলেতো আর কথাই নেই। ব্যাথাটা বেশী করে বাজে যদি কারও গাড়ীতে এবং ট্রেনে দুটোতেই যাতায়াতের সমান অভিজ্ঞতা থাকে। *মটর ওয়েতে* ১১০ কিঃমিঃ গতিতে গাড়ী চালানোর সাইনবোর্ড যেখানে ঝুলছে, *অফিস আওয়ারে* সেখানে ১০-১৫ কিঃমিঃ গতিতে গাড়ি চালাতে বাধ্য হওয়ার সময় প্রথম প্রথম মনে হতে পারে, আইন অমান্য করছি নাতো? অবস্থা যখন আরও বেগতিক, রেডিওতে *ট্রাফিক আপডেটে* অমুক রাস্তা '*চকা-ব্লক*' *(ব্লক অব চকলেট)* বা *কার-পার্ক* হিসেবে ঘোষিত হয় তখন বেচারা চালকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তবে অফিস যদি শহরের উপকণ্ঠে আর ট্রেন ষ্টেশন থেকে দূরে হয়, তখনতো আর করার কিছুই থাকে না। সাধারণ সময়ের ৩০-৩৫ মিনিটের সম্ভাব্য যাত্রা পথ তখন গাড়ীতে দেড় থেকে পৌণে দু'ঘন্টায় পাড়ি দিয়েও তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে হয়।

সূদীর্ঘ সময় গাড়ি চালিয়ে অফিস করার পর সম্প্রতি আমার সুযোগ এসেছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে চাকুরী করার। প্রথম দিনে ট্রেনে করে অফিসে যাওয়ার কথা ভেবে মনে বেশ কিছুটা সংশয় ছিল। সেই সংশয় স্বস্তিতে রুপান্তরিত হতে সময় লাগেনি। ট্রেনে যাতায়াত করার নতুন অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছি, এতদিন আমি কি হারিয়েছি। বাংলাদেশ থেকে আসার সময় প্রিয় লেখকদের বইয়ের একটা ভাল সংগ্রহ সাথে সাথে এসেছিল। প্রবাস জীবনের নানবিধ ব্যস্ত-তায় সেগুলো শেষ করার গতি এতদিন শম্বুকের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে চলছিলো। বিগত দুই-আড়াই বছরে সে সমস্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মনে হয় বাংলাদেশের সাথে আবার নতুন করে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রিয় লেখকদের নতুন বই, প্রিয়-অপ্রিয় কলামিষ্টদের সব লেখা, পত্র-পত্রিকার প্রধান বা উল্লেখযোগ্য খবরের *প্রিন্টেট কপি* ট্রেনের কামরায় বিনোদনের মাধ্যম হয়ে চোখের সামনে উপস্থিত হয়। দ্রুতযান ছেড়ে দিয়ে *লোকাল* ট্রেন ধরে আরাম করে বসে কয়েক মিনিটের বাড়তি পড়ার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে এখন কষ্ট হয়। অর্ধ-সমাপ্ত কোন বই শেষ করার জন্য ট্রেনের কামরা এখন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। এ যেন হঠাৎ উন্মোচিত একটা নতুন দিগন্ত। এই নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, দুশ্চিন্তাহীন, *ষ্ট্রেস-ফ্রি* ভ্রমণের সাথে *অফিস আওয়ারে* গাড়ি চালানোর কি কোন তুলনা হয়?

ষ্টেশনে সকালে গাড়ী রেখে, শহরমুখী ট্রেনের জন্য প্লাটফর্মে অপেক্ষা করতে করতে এখন অনেক সময়ই পুরনো বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত জনের সাথে দেখা হয়। সেদিন এক বন্ধুর সাথে প্লটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। গন্তব্য সিডনী শহর যা এখান থেকে ৩২-৩৫

কিঃমিঃ দূরে। ট্রেনে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিটের যাত্রাপথ। তাড়া আছে দুজনেরই যথাসময়ে অফিসে পৌঁছানোর। তাই দ্রুতগতির ট্রেনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। সকালের এই সময়টাতে ভীড় থাকে যথেষ্ট। আশে-পাশে সাদা-কালো-বাদামী রঙের অফিস গামী অনেক মানুষের স্নিগ্ধ চকচকে মুখ। এই সময় *লোকাল* ট্রেনে সিট পাওয়া গেলেও দ্রুতগতির ট্রেনে সে আশা নিতান্ত ই ক্ষীণ। ভাল করে দাঁড়ানোর মতো একটা জায়গা পাওয়াও বেশীর ভাগ সময় দুষ্কর হয়ে উঠে। এই পর্যায়ে বন্ধু স্মিত হেসে দার্শনিকের মতো চমৎকার একটা মন্তব্য করলো। বললো, একটা জিনিষ খেয়াল করেছিস, লোকজন ট্রেন থেকে নামার সময় যতটা ভদ্র, সৌজন্য পরায়ন হয়, মহিলা, বয়ষ্ক বা অন্য সহযাত্রীদের প্রতি যতটা সদয়তার পরাকাষ্ট প্রদর্শণ করে, ট্রেনের উঠার সময় কিন্তু ঠিক ততটা থাকে না। একই ব্যক্তির *লোকাল* ট্রেনে উঠার ভদ্রতার সাথে দ্রুতগতির ট্রেনে উঠার ভদ্রতার মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

বললাম, অবচেতন মনে খেয়াল করেছি ঠিকই কিন্ত সচেতন ভাবে কখনও এটা নিয়ে চিন্তা করিনি। ব্যাপারটা অসুন্দর, অপ্রিয় বাস্তব। লক্ষ্য তখন একটাই, সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানো। নিষ্ঠুর প্রয়োজনের দাবিতে ভদ্রতা এবং সৌজন্যের চোখ মনে হয় বন্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য বা অন্য কিছু দেখায় ব্যস্ত হয়ে উঠে? শুধু ট্রেনে কেন অফিস *আওয়ারে* গাড়ী চালানোর সময় এবং জীবনের অনেক প্রতিকুল বাঁকেই এই একই দৃশ্যের পরিবর্তিত রুপ দেখা যায় প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। এর ব্যতিক্রম আছে, হয়তো বড় ধরণেরই ব্যতিক্রম, কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়েতো আর বাস্তবের মূল্যায়ন হয় না। জীবন চলার পথের কোন এক বাঁকে এসে এই একই চরিত্রে অভিনয় করছি হয়তো আমরা অনেকেই। অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের মানুষকেও কখনো কখনো দেখা যায় এহেন চরিত্রে । কারণ হয়তো সেই একটাই, উদ্ভুত পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিপরিতে ব্যক্তি মন এবং মননের *কমফোর্ট জোন*-এর দ্বন্ধ। পরিবেশ বা পরিস্থিতি মনের এই *কমফোর্ট জনের* বাইরে গেলে অনেক সময়ই মানুষ নিজেকে নিয়ে বাপৃত হয়, ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এটা এমনি একটা অপ্রিয় অবস্থান যেটা কামনীয় নয় মোটেই সেই সাথে এড়িয়েও যাওয়া যায় না পুরোপুরি।

সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের সবচেয়ে আলেচিত চরিত্র নিঃসন্দেহে র‍্যাপিড একশ্যান ব্যাটালিয়ন(র‍্যাব)। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, গ্রামে-গঞ্জে-শহরে, চায়ের দোকানে, দেশে ও প্রবাসের বাংলাদেশী মিডিয়ায়, উপন্যাসে, কবিতায়, ছড়ায়, কলামে র‍্যাবের উপস্থিতি সর্বজনবিদিত। এর মধ্যে প্রশংসা আছে যেমন তেমনি সমালোচনা ও আছে বিস্তর । এ প্রসঙ্গে শেরে বাংলা ফজলুল হকের একটা মজার উক্তির কথা মনে পড়ে। তিনি যখন অবিভক্ত বাংলার চিফ মিনিষ্টার(১৯৩৭-৪৩) তখন তাঁর প্রশাসনিক সফলতার সাথে ব্যর্থতাও ছিল অনেক। সঙ্গত কারণেই সম-সাময়িককালে তাঁর সমালোচনাও হয়েছে প্রচুর। সেই সময় তাঁর এক মোসাহেব একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, লোকজন এই যে আপনার সম্বন্ধে এত আজে-বাজে কথা বলে, আপনি শোনেন নিশ্চয়ই কিন্তু কিছুই বলেন না, ব্যাপার কি? বাংলার বাঘ মুচকি হেসে মুখে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে, রাগ করো কেন? *আম গাছ থাকলে*

মানুষ তো মাঝে মধ্যে ঢিল মারবেই। ফজলি আম গাছে আরো একটু বেশী করে মারে। শেওড়া গাছে কেউ ঢিল মারে না।

র‍্যাবকে ফজলি আম গাছের সাথে তুলনা করলে কারো কারো হয়তো আপত্তি থাকবে। সেই তারাই নিশ্চয়ই একবাক্যে স্বিকার করড়্গে যে র‍্যাব অন্ততঃ পক্ষে শেওড়া গাছ নয়। শায়েখ আব্দুর রহমান আর বাংলা ভায়ের গ্রেফতারের পরেতো অবশ্যই নয়। র‍্যাবের প্রতি সাধারণ জনগণের মনের ভাবটা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা ভাল করেই বোঝেন। ক্রস ফায়ারে হত্যার মিথ্যা-অজুহাত, মানবতার পরিপন্থী, ক্ষমতার অপব্যবহার সহ নানা অভিযোগ আনা হয়েছে বা হচ্ছে যেই র‍্যাবের প্রতি, সেই র‍্যাবকেই অবশেষে স্বিকৃতি দিতে হয়েছে বিরোধী শিবিরের নেত্রী শেখ হাসিনাকে। বাংলা ভাইয়ের গ্রেফতারের অব্যবহিত পরে মার্চের ১৬ তারিখ আমেরিকার উদ্দ্যেশে ঢাকা বিমান বন্দর ছাড়ার আগে সাংবাদিকদের এক প্রশ্ন উত্তরে তিনি বলেন, *র‍্যাবকে বিলুপ্ত করা হবে না, দূর্ণীতিবাজদের ধরতে তাদের বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হবে।* বিরোধী শিবিরের শীর্ষ নেত্রীর কাছ থেকে এই চমৎকার সমর্থন সনদপত্র পাওয়ার পর র‍্যাবের কৃতকার্যতার আর কি কোন নতুন সনদের প্রয়োজনের আছে?

র‍্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য, ক্রস ফায়ারের মিথ্যা অজুহাতে সন্ত্রাসীদের হত্যা করা। আনিত এই অভিযোগ হয়তো সত্য নয়। আর যদি সত্যিও হয় তবু র‍্যাব বা ক্ষমতাসীন সরকার সেটা স্বিকার করার কথা নয়, করবেও না। কোন কালেই কোন সরকার এটা করে নাই আর ভবিষ্যতেও যে করবে সেটাও আশা করা যায় না। কিন্তু যুক্তি-তর্কের সুবিদার্থে যদি ধরে নেই আনীত অভিযোগ সত্য, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে? একথাতো সত্য যে সন্ত্রাসীরা ভিন্ন গ্রহ থেকে আগত কোন জীব নয়, এদেশেরই সন্তান। হয়তো পরিবেশের স্বিকার, হয়তো অমানুষ, তবু মানুষতো বটে। আর বিনা বিচারে একজন মানুষ মারা যাবে, একটা সভ্য সমাজের জন্য এটা নিঃসন্দেহে লজ্জার। কিন্তু কথা হলো, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে। তারা এব্যাপারে কি ভাবছে? তারা কি এই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সত্যিই এতটা হৃদয়হীন এবং সচেতনভাবে উদাসিন? তা না হলে এর বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার নয় কেন? আর এই যে এত শক্তিশালী বিরোধীদল, যারা প্রায় নতুন সরকারের জন্মলগ্ন থেকেই তাকে ফেলে দেয়ার নিষ্ফল আন্দোলনে রত, তারাই বা এই অমানবিক কর্মকান্ডকে একটা ইস্যূতেও পরিণত করতে পারছে না কেন?

অত্যন্ত উচ্চ মানবিক বোধ সম্পন্ন সংবেদনশীল মনের মানুষ বাংলাদেশের সাধারণ বাঙালী, এটা সর্বজন স্বিকৃত। তবে আজ তারা বিচার চায়, ন্যায্য বিচার। প্রাইমারী স্কুলের সেই ছোট্ট

ছেলেটি যার নরম তুলতুলে শরীরটাকে শতশত টুকরো করে ভিন্ন ভিন্ন বস্তায় ভরে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা, তার বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন বিচার চায়। একজন মানুষের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিনের আলোয় যখন সন্ত্রাসীরা ফুটবল খেলে, সেই বাবা-মা, সেই গ্রামের নিরিহ অধিবাসিরা তার বিচার চায়। চার-পাঁচজন নিরিহ-নিরপরাধ মানুষকে খুন করেও জেল থেকে বার হয়ে উন্মুক্ত বাজারে বুক উঁচু করে, কোমরে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যে সন্ত্রাসীরা, সেই সমস্ত পুত্রহারা দূর্ভাগা পিতামাতা, অসহায় এলাকাবাসি তাদের বিচার চায়। মুক্তি পণের নামে নিরিহ নিরপরাধ দুধের শিশুকে জিম্মি করে, হত্যা করে যে সন্ত্রাসীরা, বাংলাদেশের মানুষ তার বিচার চায়। চাঁদা প্রদানে অসম্মতি জানালে যখন শতশত নিরিহ-নিরপরাধ মানুষ খুন হয় তখন বাংলাদেশের মানুষ বিচার চায়। কিন্তু বিচার হয়না। বিগত সরকারের আমলে হয়নি, এখনও হয় না। বর্তমান সামাজিক অবস্থানে এই বিচার হওয়াই মনে হয় সম্ভব নয়। কারণ, উন্মুক্ত বাজারে হাজারও লোকের সামনে হত্যা করলো যে সন্ত্রাসীর দল, তার সাক্ষী দেয়ার জন্য একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, সাক্ষী যারা দেবে, সে বা তাদের পুরো পরিবারই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবস্থা আজ এমনি ভয়াবহ, এমনই সঙ্গীণ। সেই সাথে এই সন্ত্রাসীরা প্রায়শই এমন সব ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গের ছত্রছায়ায় বর্ধিত ও প্রতিপালিত যারা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে সব অপরাধ থেকে এদের মুক্ত করে আনার ক্ষমতা রাখে এবং মুক্ত করে আনে। তাহলে স্বজন হারানো এই যে হাজারো প্রাণের আর্ত-চিৎকার যা বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, এর কি হবে?

এইতো গতকাল ১৪ই মে-রবিবার ইস্টার্ণ প্লাজার উল্টো দিকের 'দি তুর্কি অ্যাসোসিয়েট লিমিটেড' নামের রিক্রুটিং এজেন্সিতে সন্ত্রাসীরা এসে গুলি করে রমজান মাষ্টার নামের ১ জনকে হত্যা ও ৬ জনকে গুরুতর রুপে আহত করে রেখে গেল। কারণ, এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীর দাবিকৃত ৫ কোটি টাকা চাঁদা না দেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এই এজেন্সি। কিন্তু রমজান মাষ্টার, তার কি অপরাধ? রমজান মাষ্টারের অপরাধ সে তার ছোট ভাইকে শেষ মুহূর্তের কাজে সাহায্য করতে এসেছিল, যার সেই দিন সন্ধ্যার ফ্লাইটে সৌদি আরবে যাওয়ার কথা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের মাছিহাতা গ্রামে রমজান মাষ্টারের ছোট-ছোট দু'টো ছেলে আর এক মেয়ে বাবার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে আছে। কখন ফিরবে তাদের বাবা, কার জন্যে ঢাকা থেকে কি আনবে সেই স্বপ্নে বিভোর তিনটা কচি হৃদয়। তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবরটা জানতে পেরেছে? কেমন আছে তারা? প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বল সব জীবন কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই এমনি করে ঝরে পড়বে, তছনছ হয়ে যাবে মানুষের সংসার নামের সাজানো বাগান, এ কোন বিশ্বের অধিবাসি আজ আমরা। *প্রকৃতি মানুষকে অনেক যত্নে তৈরী করে। একটি ভ্রুণ মায়ের পেটে বড় হয়। তার জন্য প্রকৃতির কি বিপুল আয়োজন। তাকে রক্ত পাঠায়, অক্সিজেন পাঠায়। অতি যত্নে তার শরীরের এক একটা অংশ তৈরী হয়।*-(হুমায়ূন আহমেদ-'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব')। এত যত্নে তৈরী একটা জিনিষ বিনা কারণে, বিনা অপরাধে, যখন-তখন ইচ্ছে মতো সন্ত্রাসী

নামের এক ভয়ঙ্কর যমদূতের হাতে খুন হবে, সেই সাথে পুরো পরিবার ভেসে যাবে বাণের জলে, এটা কি ঠিক?

২০০৪ সালের ২৬শে মার্চ জাতীয় স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে র‍্যাব জনসাধারণের সামনে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রধম অপারেশনাল দায়িত্ব পায় ১৪ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে। সেটা ছিল পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান রমনা বটমূলের নিরাপত্তা বিধান করা। র‍্যাবের পূর্ণাঙ্গ অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয় ২১জুন, ২০০৪ থেকে। প্রায় দু'বছরের এই সময় সীমায় র‍্যাবের হাতে মারা গেছে কতজন সন্ত্রাসী? সম্ভবতঃ একশ থেকে দু'শোর ভেতরের কোন একটা সংখ্যা হবে। যদি এই ২০০ জন সন্ত্রাসী আজ জীবিত থাকতো তবে আরও কতজন স্ত্রী তার স্বামী, কতজন বোন তার ভাই, কতজন মা তার পুত্র-কন্যা হারাতো তা শুধু বিধাতাই জানে? তবে সেই সংখ্যা যে ২০০ জনের বেশী হতো সেটাতে মনে হয় কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। আর সেই সাথে পরিবার পরিজনের হত্যার কোন বিচার না পেয়ে আরও কত সোনার তরুণ যে নতুন করে অস্ত্র হাতে তুলে নিতো তাই বা কে বলতে পারে?

কেন এই সন্ত্রাসী, এর সৃষ্টির মূল রহস্য কি? এটা একটা উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার বিষয়। বিজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানীরা এর বিপরিতে চমৎকার সব বিশ্লেষণ ও উপাত্ত হাজির করতে পারবে। কিন্তু তাতে করে এই মুহূর্তে সাধারণ জনগণের কি লাভ হবে? পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে মারা যাচ্ছে যে লোক, সে কিভাবে পানিতে পড়লো, কেন পড়লো তা অবশ্যই বিবেচ্য। তবে সবার আগে বিবেচ্য, তাকে পানি থেকে উদ্ধার করা, পানিতে তাকে ডুবতে দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসে আলোচনা করে বা গবেষণায় নিবদ্ধ হয়ে নয়। আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থানের দ্বিতীয় স্তরে উন্নয়নের জন্য এই সৃষ্টি রহস্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহে এবং তার শুরুটা এখনই হওয়া আবশ্যক। তবে ঠিক এই মুহূর্তে সেটা কতটা প্রাধান্য পাওয়ার দাবী রাখে সেটা সবিশেষ বিবেচ্য।

সন্ত্রাস আর মানবতার পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহবস্থান সম্ভব নয়। সন্ত্রাস আক্রান্ত বাংলার মানুষ বছরের পর বছর ধরে যে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করেছে ও করছে সেটা কোন বাঙালীরই কাম্য হতে পারে না। সেই সাথে মানুষ হিসেবে আমরা এটাও চাই না যে সন্ত্রাসীদের প্রতি অমানবিক কোন আচরণ করা হোক। এ এক মিশ্র ও বড় জটিল অবস্থান, অনেকটা মহাভারতের শেষ অধ্যায়ের সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের নবম দিনের সমাপ্তি শেষে পান্ডব শিবিরে উচ্চ পর্যায়ের মিটিং বসেছে (মহাভারত, *ভলিউম-১৩, এপিসড-৭৮)* । মিটিং-এ উপস্থিত সব রথি-মহারথিরা। সেখানে উপস্থিত ধর্মরাজ যুথিষ্ঠির, মহাবীর ভীম, অর্জুন, নকুল, সাহাদেব, পান্ডব সেনাপতি দ্রৌপদি-ভ্রাতা ধৃষ্টধামা, দ্রৌপদির বাবা মহারাজ ধ্রুপদ, অভিমন্নুর(অর্জুন-সুভদ্রা তনয়) শ্বশুর এবং উত্তরার বাবা মাৎসলের মহারাজ ভিরাত এবং পান্ডবমাতা কুন্তির ভ্রাতুষ্পুত্র ও সুভদ্রার ভ্রাতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নবম দিনের যুদ্ধ শেষে পান্ডব শিবিরে ক্ষয় ক্ষতির হিসেব করে সেনাপতি ধৃষ্ঠধামা ক্ষুব্ধ। আমেরিকান সেনাপতির ইরাক জয়ের চেয়েও তার আশা ছিল এক কাঠি বাড়া। ধৃষ্ঠধামার আশা ছিল এক সপ্তাহ নয়, একদিনের মধ্যেই কুরু পরিবারকে পরাজিত করে জয়মাল্য করায়ত্ব করবে। মাঝে বাধ সেধে

বসে আছে অপর পক্ষের সেনাপতি পরশুরাম শিষ্য, সর্বজন শ্রদ্ধেয় গঙ্গাপুত্র মহাবীর বিষ্মা। যার হাতে রয়েছে দেবতার বর, ইচ্ছা মৃত্যু কবচ। নিজে না মরতে চাইলে কারো ক্ষমতা নেই তাঁকে মৃত্যুবানে বিদ্ধ করা। নিজ প্রতিজ্ঞার বেড়াজালে আটকে পড়া বিস্মা। হাস্তিনাপুর সিংহাসনকে সুরক্ষার প্রতিজ্ঞাজালে সে আবদ্ধ। এই যুদ্ধে সব কিছু জেনে শুনেও তাকে ন্যায়ের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তার দিয়ে রাখা এই প্রতিজ্ঞার কারণেই। প্রিয় পান্ডব ন্যায়ের পক্ষে। তাঁর সমস্ত ভালবাসা-সমর্থন-আশির্বাদ রয়েছে পঞ্চপান্ডবের প্রতি। অপর পক্ষের সেনাপতি হয়েও তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চান প্রতিপক্ষই বিজয়ী হোক। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যুধিষ্ঠির তার কাছে আশির্বাদ নিতে গেলে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতায় তাকে বিজয়ী হওয়ার আশির্বাদ দিয়েছেন। কিন্তু বিস্মার মতো মহাবীর সেনাপতি যেখানে জীবিত সেখানে বিজয় আসবে কোন পথ ধরে?

কিন্তু স্বয়ং ভগবানই যদি পক্ষে থাকে তখন উপায় একটা না একটা বার হবেই। শ্রীকৃষ্ণ বড় ভাই যুধিষ্ঠির কে পরামর্শ দিলেন, তুমি তাতশ্রীর (বিস্মা) কাছে যাও এবং তাকে বল, তুমি তোমার বিজয়ী হওয়ার আশির্বাদ ফিরিয়ে নাও। যুধিষ্ঠির এবং সেই সাথে সমস্ত পরিষদের ভ্রু কুঞ্চিত হয়, তারা মুখ চাওয়াচায়ি করে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, *ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে মহা মূল্যবান একটা খালি সোনার থালা। ক্ষুধার্ত মানুষটা কি এই সোনার থালাটা খাবে, বড় ভাইয়া?* পরম

পূজনীয় তাতশ্রীর আশির্বাদ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এই আশির্বাদ দিয়ে কি হবে যদি তিনি নিজেই এর পরিপূর্ণতার অন্ত রায় হয়ে মাঝ খানে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভগবানতো জানেন, এই কথায় বিষ্মার কি প্রতিক্রিয়া হবে, সে কি করবে। তাঁর নির্ণয়তো আর ভুল হবার কথা নয়।

মানুষের জীবনে মানবতা, এই সোনার থালার চেয়ে ও মূল্যবান। কিন্তু জীবনই যদি না থাকে তাহলে এই মহা মূল্যবান থালা ধরে রাখবো কিসে? বাংলাদেশের মানুষ ও মানবতা, এই দুয়ের মাঝ খানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রাসী। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আজ তার নিজের জীবনের প্রাপ্য মানবতার এই অধিকারই বিরাট প্রশ্নের সন্মুখীন।

সন্ত্রাসীর ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষের মনের *কম্ফোর্ট জোনতো* দূরের কথা, সবটুকু সহ্য-শক্তির শেষ প্রান্তে আজ তারা। শুধু এই কারণেই হয়তো তারা মৌনতার সম্মতি লক্ষণ প্রদর্শন করেছে, দেখেও না দেখার ভান করছে, যদি ক্রস ফায়ারের আনীত অভিযোগ সত্যিই সত্যও

হয়ে থাকে। তবে একথাতো সত্য, ন্যায্য বিচার সুনিশ্চিত করার সার্বিক দায়-দায়িত্ব সরকারের। সমস্ত পৃথিবী আজ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটা কঠোর নতুন আইন, যে আইনে বাংলাদেশের সন্ত্রাসী বিচারের বর্তমান প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠে ন্যায্য ও সুবিচার নিশ্চিত করা যাবে, তার দিকে তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের জনগণ। এর জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থনের ও আজ অভাব হওয়ার কথা নয়। আর সৌভাগ্যক্রমে এই সরকারের হাতে নতুন সেই আইন প্রণয়নের সবটুকু ক্ষমতাও রয়ে গেছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা প্রণয়ন করে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া, মনে হয় দারুণ ভাবে প্রয়োজনীয়। না হলে, এইতো সেদিন ৯ই-মে মঙ্গলবার, ৫ লাখ চাঁদার টাকা আনতে গিয়ে র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছে র‍্যাব সোর্স আলী আহম্মদ সমুন । যে ঘটনার পিছনে, র‍্যাবের লেঃ কমান্ডার ফিরোজের হাত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে তাকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহারও করা হয়েছে। এখন ক্রস ফায়ারের ভয় দেখিয়ে যদি এই ধরনের অসৎ চরিত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করা শুরু করে, আর কোন কারণে ঘটনা চক্রে নিরিহ সাধারণ মানুষ মারা পড়ে, তাহলে সেটা জনগণ কোন দিনই সহজ ভাবে নেবে না। তারা ঠিকই চেনে, কে সন্ত্রাসী আর কে সন্ত্রাসী নয়। সেদিন পট পরিবর্তন হতে বেশী সময় নেবে না।

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, ২৪ মে, ২০০৬.

Email # jabedin@bigpond.net.au